সত্যের প্রকাশ

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহঃ)

মানুষ যখন আল্লাহর প্রেমে মগ্ন হয়– তখন সৃষ্টি পর্যন্ত হয়ে যায় তার কাছে প্রেমাস্পদ। সৃষ্টির মাঝেই সে আল্লাহকে খুঁজে পায়।

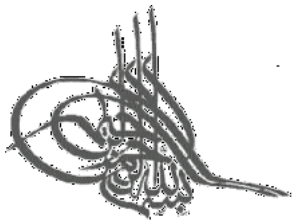

সূফী

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক একটি সংকলন

চৈত্র ১৪২২, মার্চ ২০১৬, জমাদিউস সানি ১৪৩৭

** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ প্রণীত হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরির (রহঃ) সঙ্গে ধর্ম ও দর্শনকেন্দ্রিক কথোপকথন "সংলাপ সমগ্র" গ্রন্থটি পুনরায় ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক সংকলন 'সূফী'-তে ধারাবাহিক ছাপা হচ্ছে। তাঁর (প্রফেসর হারুন-উর-রশিদ) সদয় অনুমতি নিয়েই আপনাদের সামনে আবার 'সংলাপ'গুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। **

জমার টাকা সঙ্গে নিও কিন্তু

আমিন : আপনি একদিন বলেছিলেন দেহতত্ত্ব ছাড়া খোদাতত্ত্ব বোঝা যায় না। কথাটির অর্থ ঠিক বুঝতে পারিনি।

গুরু : মানুষের দেহ মানুষকে একদিকে যেমন পশুর সমতুল্য করেছে অন্যদিকে এই দেহকে নির্ভর করেই সে খোদার দিদার বা দর্শন লাভ করে। দেহ একটি যন্ত্রবিশেষ– এর চেয়ে কোনো সূক্ষ্ম এবং কার্যকর যন্ত্র মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। এ দেহের কিছু কর্ম সে নিজে নিয়ন্ত্রণ করে– কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সে সজ্ঞানে ব্যবহার করে। কিন্তু কিছু কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর তার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ নেই। যেমন তার হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, পরিপাক যন্ত্র ইত্যাদি। পশুর সঙ্গে তার তফাৎ হচ্ছে এই যে পশু তার দেহটাকে ব্যবহার করে কিন্তু দেহটা নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনা করে না, করতে পারে না। মানুষের দেহের ভেতর রূহ সঞ্চারিত হয় সে যখন মায়ের গর্ভে থাকে এবং সে মুহূর্ত থেকে রুহ বের হয়ে যাবার মুহূর্ত পর্যন্ত সে সক্রিয় থাকে। রুহ বের হয়ে গেলে দেহটির কোনো মূল্য থাকে না– মাটির দেহ মাটিতেই মিশে যায়। মানুষের দেহের মধ্যে পাঁচটি জানালা আছে যা দিয়ে সে বস্তুজগৎকে অনুভব করে। কিন্তু তার অন্তরেও এমনি অনেক জানালা আছে যে পথ দিয়ে সে দেখা জিনিসকে বারবার দেখতে পারে– শুধু তাই নয় অদেখা জিনিসকেও অন্তরঙ্গভাবে দেখতে পারে। সে যখন তার অন্তরের ঐশ্বর্য সম্পর্কে অবগত হয়– তখন একদিকে সে দেহকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে– দেহের জৈবিক ক্ষুধাকে বশে আনতে শেখে– অন্যদিকে তার দেহের মধ্যেই অনেকগুলো অদৃশ্য বন্দরে বাতি জ্বলে ওঠে। দেহের এ বন্দরগুলোকেই তরিকতের ভাষায় বলে লতিফা। নফস, ছের, খফি, ক্বালব, রুহ এবং আগফা এবং এই সঙ্গে দেহের আনাসির– মাটি, হাওয়া, আগুন, পানি– সব মিলে মোট দশটি বন্দর আছে মানুষের দেহে। মানুষ যখন নিরন্তর সাধনার বলে এ বন্দরগুলোর সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করে– তার আরাধনার নৌকা যখন ক্রমাগত একের পর এক এই বন্দরগুলোতে ভিড়বার চেষ্টা করে তখনই একে একে সব বাতি জ্বলে ওঠে। মানুষ বিস্ময়ে চেয়ে দেখে এর কোনোটির রঙ নীল, কোনোটির রঙ আগুনের মতো লাল। স্রষ্টার স্মরণ বা জিকির তার দেহকে দেয় ফেরেশতার মহিমা– পশুত্বকে অবদমিত করে সে তার নফসকে পরিণত করে ক্রীতদাসে। আর আরাধনার এ পর্যায়েই সে কামনা করে স্রষ্টার সান্নিধ্য– নিঃশেষে বিলীন হতে চায় সে পরমাত্মার মাঝে।

আমিন : মানুষের দেহটাই তো যতো অনর্থের মূল। এটা না হলে কী ক্ষতি হতো?

গুরু : দেহ ছাড়া মানুষ মানুষ হতো না। হয়তো অন্য কিছু হতে পারতো, কিন্তু মানুষ নয়। আল্লাহ তাঁর যাতের মহিমাকে প্রকাশ করার ইচ্ছা করলেন যাঁকে ভালোবেসে তাঁকে তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ হিসেবে। তাঁর মধ্যেই তিনি সৃষ্টির সকল মহত্ত্বকে বিকশিত করেছেন। ফলে মানুষ হয়েছে সৃষ্টির সেরা– আশরাফুল মাখলুকাত। এ মর্যাদা ফেরেশতাকে দেয়া হয়নি। মানুষকে আল্লাহ দিয়েছেন আক্‌ল (বুদ্ধি), ফাহম (বিবেক), ইদরাক (জ্ঞান) এবং গুমান (চিন্তা)– এ চারটি গুণই মানুষকে দিয়েছে তার অনন্যতা। অন্য কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহ এ নেয়ামত দেননি। সে জন্যই মানুষের বিচার হবে– অন্য কোনো সৃষ্টির বিচার হবে না।

আমীন : কিন্তু দেহ থাকলেই কি কেউ নিজেকে আশরাফুল মাখলুকাত বলে দাবি করতে পারে?

গুরু : সৃষ্টির সেরা হবার জন্য যেসব গুণ মানুষকে অর্জন করতে হয় সেগুলো অর্জন করার আগে মানুষ নিজেকে সেরা বলে দাবি করতে পারে না। সব মানুষ তো মানুষই নয়। আশরাফিয়াত বা শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে একটা লক্ষ্য বা গন্তব্য। এ গন্তব্যে পৌঁছতে হলে চাই নিরন্তর সাধনা। জন্মসূত্রে মানুষ যা লাভ করে তা হচ্ছে এই আশরাফিয়াতের সম্ভাবনা। কিন্তু আত্ম-অহঙ্কারে যে নিজেকে মনুষ্যত্ব অর্জনের আগেই মানুষ বলে দাবি করে– নিজেকে আশরাফুল মাখলুকাত বলে সে তো সত্যকেই জানতে চাইলো না– মিথ্যা অহঙ্কারে নিজেকে পশুর চাইতেও নিচে নামিয়ে আনলো। দেখো, মানুষের মধ্যে জীবন যাপনের বিচারে চারটি ভাগ করা যায়– অনুগত জীবন, অনুতপ্ত জীবন, অতৃপ্ত জীবন এবং অভিশপ্ত জীবন। যে মানুষ নিজের সব ইচ্ছাকে স্রষ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ করলো এবং সৃষ্টিকে ভালোবাসলো সর্বান্তকরণে সে মানুষের জীবনই হচ্ছে অনুগত জীবন। এরাই হচ্ছে আল্লাহর ওলি বা বন্ধু। কিছু মানুষ জীবনের বাঁকে বাঁকে পা পিছলে পড়ে যায় এবং সে জন্য অনুতপ্ত হয়, বারেবারে ক্ষমা ভিক্ষা করে– এমন মানুষের জীবনকেই বলবো অনুতপ্ত জীবন। কিন্তু কিছু মানুষ জীবনের কোনো কিছুতেই তৃপ্তি খুঁজে পায় না। এক অতৃপ্তি থেকে অন্য অতৃপ্তির দিকে ধাবিত হয়। এরই নাম অতৃপ্ত জীবন। এরা সম্পূর্ণত তাদের অন্তর্জীবনকে অস্বীকারও করে না। এদের কাছে জীবন মানে এক ধরনের জ্বালা– এদের কোনো সুখ নেই কারণ এরা নিরন্তর এক সুখ থেকে অন্য সুখের দিকে ধাবিত হয়। আল্লাহর ইচ্ছা হলে এদের মনেও হেদায়েতের প্রদীপ জ্বলে উঠতে পারে। অনুতপ্ত জীবনের দিকে ধাবিত হবার সম্ভাবনা এদের সম্পূর্ণ রহিত হয়ে যায় না। আর একদল মানুষ আছে যারা স্রষ্টাকেই অস্বীকার করে– অস্বীকার করে জীবনের উৎসকে। এরা ভুলে যায় এদের যাত্রার কথা। জীবন নামক বিরতির স্টেশনকেই এরা একমাত্র সত্য বলে দাবি করে। এদের জীবনই অভিশপ্ত। এদের উৎসমুখে ফেরার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এরা জীবনের এই রঙিন মেলায় ইন্দ্রিয় সেবায় ব্যস্ত। ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিই এদের জীবনের একমাত্র মোক্ষ। এই দেখো না, কিছু লোক আছে যাদের কতো টাকা আছে তারা নিজেরাই জানে না। কিন্তু এরা আরো টাকা চায়। এ এক সর্বনাশা নেশা– ভোগের জন্য টাকা নয়– টাকার জন্য টাকা চাই। এদের চোখ চিরতরে অন্ধ হয়ে যায়। ওরা নিজের চারপাশে কিছুই দেখতে পায় না। এরই নাম অভিশপ্ত জীবন। আমীন এখন বলো দেখি আশরাফুল মাখলুকাত বলে দাবি করার অধিকার কোন মানুষের আছে! দেহ থাকলেই মানুষ মানুষ হয় না। চোখ থাকলেই মানুষ দেখতে পায় না। দেহটাকে যতক্ষণ মালিকের কাছ থেকে পাওয়া আমানত বা গচ্ছিত ধন ভাববে ততক্ষণ এ দেহ তোমার বিপদের কারণ হবে না। কিন্তু যখন নিজেকে দেহের মালিক ভাবতে শুরু করবে তখনই বিপদ। ঢাকা থেকে সাভার যাবার পথে দেখবে জমিতে সাইনবোর্ড টাঙানো থাকে– 'এই জমির প্রকৃত মালিক জনাব..... '। হয়তো তার পাশেই দেখবে কবরস্থান যেখানে 'প্রকৃত মালিক' শায়িত রয়েছেন। জীবিত মালিকরা শায়িত মালিকদের দেখেও শেখে না, শোনে না কিছুই। চোখ থাকলেই মানুষ যে দেখতে পায় না– এ সত্যটাকে কি এরপরও অস্বীকার করবে? দেহটা একটা যন্ত্র– আর এ যন্ত্রের নির্ধারিত সময়ের চালক তুমি– দেহের যিনি মালিক তিনি তোমাকে এ যন্ত্রটি কিছুকালের জন্য চালাতে দিয়েছেন। দিনের শেষে যন্ত্রটিকে মালিকের কাছে বুঝিয়ে দিতে হবে– গাড়ির জমার টাকা না দিলে মালিকই বা শুনবেন কেন। জমার টাকা সঙ্গে না নিয়ে মালিকের কাছে যেও না কিন্তু! ■

এতে রুমি ভীষণভাবে ভেঙে পড়েন এবং সবকিছুর প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলেন। অনেক চেষ্টা করে শামসকে কুনিয়ায় ফিরিয়ে আনা হয়। এতে রুমি যেন নতুন জীবন ফিরে পান, কিন্তু আবারো তিনি সামা-সঙ্গীত ও শামসের সাথে একান্তে সময় কাটাতে থাকেন। ভক্তরা আবারো বিরক্ত হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে তারা শামসকে হত্যা করে অথবা শামস চিরদিনের জন্য নিখোঁজ-নিরুদ্দেশ হয়ে যান।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাঁকে না পেয়ে রুমি তাঁর এক ভক্ত সালাউদ্দিনের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তাঁর মৃত্যুর পর রুমি আরেক ভক্ত হুসামুদ্দিনের সাথে অনুরূপ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এসব ব্যক্তির সাথে ঐকান্তিক মানবিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে রুমি আধ্যাত্মিক চেতনার এক নবতর স্তরে উপনীত হন। স্রষ্টার স্বরূপ ও সৃষ্টি, বিশেষ করে মানুষের সাথে স্রষ্টার সম্পর্কের ভিত্তি ও বিস্তার নিয়ে ধর্মসাধনার এক নতুন পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেন। যা অস্থির অতৃপ্ত মানব-হৃদয়কে তৃপ্ত ও প্রশান্ত করে তুলতে সক্ষম।

শামস তাবরিজির সাথে রুমির সাক্ষাৎ ঘটে ৩৮ বছর বয়সে। এ বয়সেই তিনি যথেষ্ট খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তাবরিজির সাথে সাক্ষাৎ-পরবর্তী ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় রুমি তাঁর পূর্ববর্তী জীবনের যশ-সুখ্যাতির প্রতি মোটেও আকৃষ্ট ছিলেন না। সবাই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেও তিনি অতৃপ্ত আত্মা নিয়ে এক মহাপরিবর্তনের অপেক্ষায় ছিলেন। শামস তাবরিজির সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমেই সেই মহাপরিবর্তন সাধিত হয়। তাবরিজি রুমির চিন্তাদর্শন, জীবনধারা সবই একেবারে বদলে দেন। মূলত মওলানা রুমির প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনের সূচনা হয় এখান থেকেই। যা তাঁর রচনাবলির মাধ্যমে বিশ্বজোড়া ছড়িয়ে পড়ে এবং সমাদৃত হয়।

রুমির সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ মাসনাভি শরিফ। মূলত এর মাধ্যমেই তাঁর বিশ্বজোড়া পরিচিতি ঘটলেও এর বাইরেও তাঁর আরও কিছু রচনা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে: দিওয়ানে শামস তাবরিজি, গদ্যগ্রন্থ ফিহ্ মা ফিহ্, মাকতুবাত, মাজালিসে সাব'আ এবং রুবাইয়াতে রুমি।

দিওয়ানে শামস তাবরিজি মূলত রুমির গজল সংকলন। এতে গজল ও তারজিবান্দ-এর পঙ্‌ক্তি সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার। রুবাইয়াতে রুমি'তে রুবাইর পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ৩৬৭৬। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা মাসনাভি শরিফে পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ছাব্বিশ হাজার। মোট ৬টি দাফতার বা পর্বে এটি সম্পন্ন হয়েছে। এ গ্রন্থে রুমি তাঁর দার্শনিক বক্তব্যকে অত্যন্ত সহজ-সরল প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপনের জন্য নানা গল্পের অবতারণা করেছেন এবং মানবাত্মাকে বাঁশির সাথে তুলনা করে বলতে চেয়েছেন– যে বাঁশির সুর আমাদের পুলকিত করে, বিমোহিত করে, আলোড়িত করে, আসলে তা কিন্তু সুর নয়; বরং তা হচ্ছে বাঁশির কান্না। কেন তাঁর এই কান্না? এর উত্তরে মওলানা বলেছেন, কারণ, তাকে তার মূল আবাস বাঁশঝাড় থেকে কেটে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তাই সে তার মূল আবাস অর্থাৎ বাঁশঝাড়ে ফিরে যেতেই আজীবন কেঁদে চলেছে। আর আমরা বাঁশির সেই কান্নাকে বলছি বাঁশির সুর।

রুমির দৃষ্টিতে মানবাত্মাও মূলত পরমাত্মা তথা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কাছ থেকে ছিন্ন হয়ে এই নশ্বর মানবদেহ-পিঞ্জরে আটকা পড়েছে। সে তার মূল আবাস পরমাত্মার সান্নিধ্যে ফিরে যেতে সদা উদগ্রীব। পৃথিবীর সব পাওয়াও তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। মনের কোন গহিনে যেন একটা অতৃপ্তি, একটা শূন্যতা, একটা না পাওয়ার বেদনা সব সময় উসখুস করতে থাকে। সেই অতৃপ্তি, সেই শূন্যতা, সেই না পাওয়ার বেদনা মূলত আর কিছুই নয়, পরমাত্মা তথা খোদা তাআলার সান্নিধ্য না পাওয়ার বেদনা, পরমাত্মার সাথে মিলন না হওয়ার বেদনা। যা শুধু 'লেক্বায়ে রাব্বি' বা পরম স্রষ্টার সান্নিধ্যের মাধ্যমেই বিদূরিত হওয়া সম্ভব। তাই সেই বাঁশির সুরের বর্ণনার মাধ্যমেই রুমি তাঁর মাসনাভি শুরু করেছেন:

কী কাহিনি বলছে বাঁশি অন্তর দিয়ে শোন তা বিরহের আর্তি এ যে করুণ সুরে বাজছে আহা।

যেদিন আমায় বাঁশঝাড় থেকে আনলো কেটে সেদিন থেকেই আমার বিরহ-ব্যথায় নারী-পুরুষ পড়ছে ফেটে।

এভাবেই রুমি আত্মাকে বাঁশির রূপক-এর সাথে তুলনার মাধ্যমে অতৃপ্ত মানবাত্মার অতৃপ্তির কারণ আবিষ্কার করেছেন, আজ থেকে প্রায় সাড়ে সাতশ বছর আগে।

মাসনাভির মূল সুর বা কেন্দ্রগত প্রসঙ্গ প্রেম। প্রেমকে তিনি বিশ্বের আত্মা বলে অভিহিত করেছেন। প্রেমেই বিশ্বের সৃষ্টি, প্রেমই তার স্থিতি, আর প্রেমেই নবতর সৃষ্টি সম্ভাবনার উদ্দেশে বস্তুজগতের বিলয়। সঞ্চরণমান জীবনের মূলে রয়েছে প্রেম। প্রেমই জীবনের নিগূঢ়তর রহস্য। প্রেমের জন্যই বাঁশির বুকে সঙ্গীত-সুর ধ্বনিত হয়। জীবনের উৎসের মূলে গিয়ে পৌঁছার জন্যই প্রেম বিচ্ছেদের হাহাকারে কাঁদতে থাকে। প্রেমের তাগিদ না থাকলে সুন্দরের দিকে কেউ চোখ মেলে থাকতো না। প্রেমের উন্মাদনায়ই প্রেমিক পরমাত্মার রহস্যের পর্দা উন্মোচনে প্রয়াসী হয়ে ওঠে। এই প্রেম-সত্যই ধ্বনিত হয়েছে রুমির সমস্ত রচনায়, সমস্ত চেতনায়, চিন্তা-দর্শনে। মাসনাভির বিখ্যাত অনুবাদক ও ভাষ্যকার অধ্যাপক আর. এ. নিকলসন-এর ভাষায়:

This Book of Mathnawi, which is the root of the roots of the (Muhammadan) Religion in respect of (its) unveiling the mysteries of attainment (to the Truth) and of certainty; and which is the greatest science of God and the clearest (religious) way of God and the most manifest evidence of God.

রুমির মতে প্রেম বা এশক হচ্ছে কারো সাথে অথবা কোনো সত্তার সাথে হৃদয়ের আবেগপূর্ণ সম্পর্ক। কোনো কিছু কামনার উৎসারিত আকর্ষণ। আল্লাহর সন্ধানে যে দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা মানুষের সামনে রয়েছে, যার প্রান্তসীমায় আল্লাহর মিলন– পরমাত্মার সাথে মানবাত্মার মিলন– সেই পথ অতিক্রম করার একমাত্র বাহন হলো প্রেম। ইবনুল আরাবি এই প্রেমকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন: স্বাভাবিক প্রেম বা মানবীয় প্রেম, আধ্যাত্মিক প্রেম এবং ঐশী প্রেম। আরাবির মতে, মানবীয় প্রেম কখনো একজন সাধককে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দিতে পারে না। কেবল ঐশী প্রেমই প্রেমিক ও প্রেমাস্পদরূপী মানবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন ঘটিয়ে সমগ্র সত্তায় ঐক্যানুভব ঘটায়। রুমিও আরাবির এই মত সমর্থন করেছেন।

অধ্যাত্ম দর্শনে প্রেম সমস্যা একটি মৌলিক সমস্যা। ইসলামি অধ্যাত্মবাদে প্রেম বিষয়টি অত্যন্ত গভীর ও সূক্ষ্ম বিষয়। সত্যের আলোয় অবগাহন করে নিজেকে পূত-পবিত্র করা যায় এমন আলোকচ্ছটাই হচ্ছে প্রেম। এই প্রেম-সত্যই ধ্বনিত হয়েছে রুমির সমগ্র রচনায়। রুমির অধ্যাত্মবাদের মূল উৎস হচ্ছে এই ঐশী প্রেম। প্রেমকে তিনি ব্যবহার করেছেন একটি অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক চেতনা ও শক্তি হিসেবে। পবিত্র কুরআনে বিধৃত প্রেমের ধারণাকে তিনি শুধু ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনের ভিত্তি হিসেবেই ব্যবহার করেননি, একই সাথে তাকে সর্বস্তরের সব সত্তার মধ্যে একটি সৃষ্টিশীল, সংস্কারধর্মী ক্রমবিকাশমান প্রবণতা বা শক্তি হিসেবে দেখেছেন। প্রেমকে তিনি চিত্রিত করেছেন মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার বিচ্ছেদের পর পুনর্মিলনাকাঙ্ক্ষা হিসেবে। এই পুনর্মিলনে প্রেমের সাথে প্রজ্ঞারও প্রয়োজন। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই রুমি প্রেম ও প্রজ্ঞার দূত, আত্মার বাঁশিবাদক।

রুমির মতে, ঐশী প্রেম সব ব্যাধির মহৌষধ। প্রেম যেমন মনকে মলিনতা ও পাপাসক্তি থেকে মুক্ত রাখে, তেমনি তা আত্মাকে নির্মল ও উন্নত করে। তাই প্রেমকে তিনি অবিনশ্বর প্রাচুর্য হিসেবে দেখেছেন। দেখেছেন জীবনদায়ী শক্তি হিসেবে, আনন্দের উৎস হিসেবে। এই গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে রুমি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। রুমি তাঁর মুর্শিদ শামস তাবরিজির মাধ্যমে যে প্রেমের সন্ধান লাভ করেছিলেন তার প্রভাব তিনি ব্যক্ত করেছেন এভাবে:

মৃত ছিলাম, জীবিত হলাম কান্নারত ছিলাম, সহাস্য হলাম।
প্রেমের প্রাচুর্য এলো তাইতো আমি অবিনশ্বর প্রাচুর্য হলাম।

রুমির আধ্যাত্মিক দর্শনের মূল বিষয় এই প্রেম। রুমির মতে, মানবাত্মা ও

(এরপর পৃষ্ঠা ৩)

পরমাত্মার মধ্যকার শাশ্বত ঐক্যই হচ্ছে এই প্রেমের মূল। এই প্রেম বর্ণনাতীত। জীবন ও প্রেমের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। সঙ্গীতের মাধ্যমে এর আংশিক প্রকাশ করা যায় মাত্র। তাঁর মতে:

প্রেমের যতই করি না কেন ব্যাখ্যা-বর্ণনা যখন নিজে প্রেমে পড়ি তার জন্য হই লজ্জিত

মুখের ভাষা যদিও সুস্পষ্ট কিন্তু ভাষাহীন প্রেম তার চেয়ে সুস্পষ্টতর।

রুমির মতে, দেহ মানবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের অন্তরায়। তাই দৈহিক নিয়ন্ত্রণই আত্মার মুক্তি। দেহের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত যে কামনা মানুষকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করে, তাকে লক্ষ্যচ্যুত করে, ভোগলিপ্সু করে তোলে, তার নাম নাফ্স। নাফ্সের দমনেই দেহের কর্তৃত্বের অবসান বা দেহের ধ্বংস এবং আত্মার স্বাধীনতার দ্বারস্বরূপ। তাই নাফ্সের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম জীবনব্যাপী। এই সংগ্রাম সেদিনই শেষ হবে, যেদিন নাফ্স সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে আত্মার আজ্ঞাবহ হবে। দেহ আত্মার মুক্তিলাভের পথে অন্তরায় না হয়ে এর বাহনরূপে ব্যবহৃত হবে। অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকদের ভাষায় এরই নাম হচ্ছে 'ফানা' বা লয়। এই স্তর অতিক্রম করে যখন আল্লাহর সাথে পুনর্মিলনের স্তরে পৌঁছা যায়, তখনই এক নবজীবনের অধিকারী হওয়া যায়। মানবাত্মা খুঁজে পায় তার আজীবন-আরাধ্য অভীষ্টকে– তার মূল উৎসস্থলকে, যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে এই মর্তলোকে এসে দেহ-পিঞ্জরে বন্দি হয়েছিল, যার সাথে মিলনাকাঙ্ক্ষায় সে অস্থির ছিল প্রতিক্ষণ, যার কারণে পৃথিবীর কোনোকিছুই তাকে পূর্ণ পরিতৃপ্ত করতে পারেনি কোনোদিন। সুফি দার্শনিকদের ভাষায় এই স্তরের নাম হচ্ছে 'বাকা'।

লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে, রুমি তাঁর মাসনাভির কোথাও সরাসরি কোনো তত্ত্ব উপস্থিত করেননি। ছোট ছোট হেকায়াত বা গল্পের মাধ্যমে, গল্পের প্রতীকী চরিত্রের মাধ্যমে ইশারা-ইঙ্গিতে তাঁর তত্ত্ব ব্যক্ত করেছেন এবং এগুলোর উপস্থাপন এতটাই সাবলীল ও সুস্পষ্ট যে, এসব তত্ত্বের তাৎপর্য উদ্ধারের জন্য তত্ত্বাভিজ্ঞ পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না। যে কোনো সাধারণ পাঠক মাত্রই তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন।

মানবচিত্তের তৃপ্তি অর্থ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি কোনোকিছুতেই নেই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী অথবা সেরা ক্ষমতাধর কেউই তার স্ব-অবস্থানে পরিতৃপ্ত নয়। মূলত সত্যের সাধনাই মানবহৃদয়ের চরম ও পরম সাধনা। পরম সত্যকে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি কাজের মধ্যে অনুভব করাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনা, পরম তৃপ্তি। যে যতটুকু এই পরম সত্যকে অনুভব করতে পেরেছে, সে ততটাই পরিতৃপ্ত হয়েছে। এই জগৎ, এই জীবন, এই অনন্ত সৃষ্টির উৎসে যিনি রয়েছেন এবং থাকবেন, যিনি চিরসত্য, অনন্ত, অবিনশ্বর, সর্বব্যাপী, যিনি আমাদের ভালোবাসেন অকাতরে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ কোনো পরিচয়ই যাঁর কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে না, সবই তাঁর সৃষ্টি– এই পরিচয়ই যাঁর কাছে মুখ্য, সেই অশ্রুত পরমাত্মাকে ঘিরেই রয়েছে মানুষের প্রচ্ছন্ন সাধনা ও পরম আত্মতৃপ্তি। সেই স্রষ্টা আল্লাহকে হৃদয়ে ধারণ করা, তাঁর সাথে মিশে যাওয়া বা একাত্মতা ঘোষণা করা, সর্বপ্রকারে সত্য, সুন্দর ও পূর্ণ হয়ে ওঠাই তো জীবনের পরম আরাধ্য। এই আরাধনার পরিপূর্ণ রূপ আমরা দেখি আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধক মহাপুরুষ মওলানা জালালুদ্দিন রুমির জীবনে। রুমির বিশ্ববিশ্রুত মাসনাভিতে পবিত্র কুরআনের মর্মকথা রূপক ও উপমার মাধ্যমে কাহিনি ও কাব্যে চিত্রিত হয়েছে বলেই এ গ্রন্থকে ফারসি ভাষার কুরআন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আত্মার বিরহ-ব্যথার বাঁশির সুরেই আত্মাকে পরিতৃপ্ত করার প্রয়াস চালিয়েছেন রুমি। রুমি তাঁর কবিতার বাঁশির সুরের মূর্ছনায় আত্মার অন্তঃস্থলে যে অপূর্ব দ্যোতনা সৃষ্টি করেছেন বিশ্বসাহিত্যের আর কোনো কবির কবিতায় তার তুলনা আছে বলে আমাদের জানা নেই।

রুমি তাঁর সমগ্র রচনার মূল বক্তব্য এবং তাঁর আচরিত ব্যক্তিগত জীবনধারার মাধ্যমে ঐশী প্রেমের ভিত্তিতে এক সর্বজনীন মানবিক সম্পর্ক গড়ে তোলাকেই সব ধর্মের অন্যতম মূল লক্ষ্য বলে স্থির করেন। স্রষ্টার স্বরূপ ও সৃষ্টি, বিশেষ করে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের সাথে স্রষ্টার সম্পর্কের ভিত্তি ও বিস্তার নিয়ে ধর্মসাধনার এক নতুন পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি ইসলামি সুফি সাধনার ক্ষেত্রে 'মাওলাভিয়া' নামে একটি নতুন তরিকার সূচনা করেন। 'নৃত্যশীল দরবেশ' নামে সারা পৃথিবীতে এটি পরিচিতি লাভ করেছে। সুফি সাধনার ক্ষেত্রে কেবল নয়, আজকের দিনে যাকে মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis) বলা হয় তারও তিনি অন্যতম পথিকৃৎ পুরুষ। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্যের একমুখী ও বিশেষ ধরনের মনঃসমীক্ষণের বিপরীতে রুমীর মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি অনেক বেশি বহুমুখী, গভীর, ব্যাপক ও সব বয়সের মানুষের জন্য সমান প্রযোজ্য। কেবল ব্যাপকভিত্তিক ও সবার জন্য প্রযোজ্য মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি নয়, বরং পাশ্চাত্যে এখন Philosophical I Theological Anthropology নামে যে জ্ঞান-শাখা গড়ে উঠেছে, রুমিকে তার অন্যতম জনকও বলা যেতে পারে।

মানুষের বিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করে সামগ্রিকতায় উপনীত হওয়া, খণ্ডবোধ থেকে অখণ্ডের উপলব্ধি লাভ করা, সর্বোপরি মানবত্ব থেকে ঐশ্বরিকত্বে (from humanity to divinity) উপনীত হওয়ার জন্য এক গভীরতম অনুভূতি, যাকে তিনি এশক বলেছেন। এজন্য তাঁকে 'প্রেমের দূত' (Messanger of Love) বলা হচ্ছে। তবে তাঁর এ প্রেম সংকীর্ণ রূপক মোহ বা কোনো সসীম লক্ষ্য-তাড়িত নয়, এটি সর্বব্যাপক, সর্বপ্লাবী সর্বজনীন প্রেম। যার লক্ষ্য পরম স্রষ্টার নৈকট্য লাভ, সৃষ্টি তথা মানবীয় সংকীর্ণতা, সসীমতা ও আংশিকতাকে অতিক্রম করে একক, পূর্ণ, অসীম ও অখণ্ড সত্তার দিকে ধাবিত হওয়া, তাঁর অসীম ইচ্ছার মধ্যে নিজের সসীম ইচ্ছাকে বিলীন (ফানা) করে দিয়ে স্থায়িত্ব (বাকা) লাভ করা।

প্রকৃত অর্থে আমরা প্রতিটি মানুষই এক একটি বিচ্ছিন্ন এবং খণ্ড সত্তা এবং নিজের অন্তর্জগতে একা। বস্তুত পক্ষে সৃষ্টি যেদিন থেকে তার স্রষ্টা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই মর্তলোকে ছিটকে পড়েছে, সেদিন থেকেই সে একা হয়ে গেছে। তাই সে হাজার কোলাহলের মাঝেও একাকীত্ব অনুভব করে, তাই তার স্রষ্টা বা মূলের কাছে ফিরে যাওয়ার আকুতি। মূলত এই সত্যই বিবৃত হয়েছে রুমির রচনা সমগ্রে। বিশেষ করে তাঁর মাসনাভিতে। আর সে কারণেই পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের যে কোনো ধর্মের মানুষের কাছেই রুমির সমান সমাদর। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, যতই দিন যাচ্ছে রুমির পাঠকপ্রিয়তা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভাষান্তরিত হয়ে ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শ্রেণিতে দর্শনের ছাত্রদের পাঠ্যসূচিভুক্ত হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ পাঠকদেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট করছে রুমির কবিতা। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে রুমির মাসনাভি (মূল এবং বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ মিলে) এ পর্যন্ত প্রায় পৌনে দুই কোটি কপি বিক্রি হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো কাব্যগ্রন্থের বিক্রি সংখ্যার এটিই সর্বোচ্চ রেকর্ড। এটি সম্ভব হয়েছে এ কারণে যে, রুমি মানুষের মনের কাছাকাছি যেতে পেরেছিলেন, মানুষের মনের অস্থিরতা প্রশমিত করার মূলমন্ত্র রুমি জানতেন। তাই মানুষের খণ্ডত্ব বা একাকীত্বের অবসান ঘটিয়ে অখণ্ড ও চিরন্তন স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে রুমির কবিতা ও চিন্তা-দর্শন সংযোগ-সেতু হিসেবে পথ করে দিয়েছে। বাঁশি হয়ে সুর তুলেছে আত্মার একাকীত্বের শূন্যতার নৈঃশব্দে। ◘

লেখক: চেয়ারম্যান, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূত্র: ইন্টারনেট

মওলানা জালালুদ্দিন রুমি : আত্মার বাঁশিবাদক

ড. আবদুস সবুর খান

ইসলামের শাশ্বত দর্শন আর পবিত্র কুরআনের অমিয় বাণীকেই আরও সাবলীল ব্যাখ্যায় অস্থিরচিত্ত মানুষের আত্মার প্রশান্তর জন্য বাঙ্ময় করে তুলেছেন মানবতা ও আত্মার বাঁশিবাদক কবি মওলানা জালালুদ্দিন রুমি তাঁর মাসনাভি শরিফ-এ। তাই বর্তমান বিশ্ব জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শান্তিপিয়াসী মানুষের আত্মায় ঠাঁই করে নিয়েছে তাঁর কবিতার অমোঘ বাণী। রুমি তাঁর কবিতায় প্রেমের যে অমিয় সুধা বিলিয়েছেন, তৃষ্ণার্ত মানবাত্মা আজও সেই সুধা পান করে স্বর্গীয় প্রশান্তিতে পরিতৃপ্ত হচ্ছে। বর্তমান বস্তুবাদী সভ্যতার চূড়ান্ত উৎকর্ষের যুগে বিশ্বমানবতা যখন হত্যা, জিঘাংসা, প্রতিহিংসা আর প্রতিশোধ পরায়ণতায় নিত্য-কলহে লিপ্ত; জাতিতে-জাতিতে, সভ্যতায়-সভ্যতায়, দেশে-দেশে, এমনকি ভাইয়ে-ভাইয়ে স্বার্থের দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়ে অসহায় মানবতা যখন অস্থির-অশান্ত–একটু প্রশান্তি, একটু ভালোবাসা, একটু সৌহার্দ্যের বাণীর প্রত্যাশায় সদা উৎকর্ণ, ফারসি ভাষার সর্বজনীন মানবতার কবি জালালুদ্দিন রুমিকেই আমরা তখন আত্মার বাঁশিবাদক হিসেবে কাছের মানুষ হিসেবে দেখতে পাই। তপ্ত মরুর বুকে কাঙ্ক্ষিত মরুদ্যানের মতো তাঁর কবিতার অমিয় বাণী তৃষ্ণার্ত মানবাত্মার রুক্ষ অলিন্দে শীতল হাওয়ার পরশ বুলায়।

১২০৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর তদানীন্তন পারস্যের খোরাসান প্রদেশের (বর্তমানে আফগানিস্তানের অন্তর্গত) বাল্‌খ শহরের একটি অভিজাত পরিবারে রুমির জন্ম। তাঁর পিতা বাহাউদ্দিন ওয়ালাদ ছিলেন সেই সময়ের একজন বিখ্যাত আলেম, সুফিসাধক ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁর পাণ্ডিত্যের কারণে তাঁকে 'সুলতানুল উলামা' (জ্ঞানীদের সম্রাট) বলা হতো।

রুমির স্নেহময়ী মাতা ছিলেন আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খাওয়ারযম শাহ্-এর বংশধর। অন্য এক বর্ণনামতে তিনি ছিলেন খাওয়ারযম শাহ্-এর কন্যা। তাঁর নাম মালাকায়ে জাহান। খাওয়ারযম শাহ্ ছিলেন খোরাসান থেকে ইরাক পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তিশালী বাদশাহ।

রুমির পিতা বাহাউদ্দিন একজন অত্যন্ত উঁচু মাপের আলেম ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তি ছিলেন, যে কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর অসংখ্য ছাত্র ও ভক্ত ছিল। তিনি রাজপরিবারে বিয়ে করেছিলেন। স্বয়ং সুলতান ছিলেন তাঁর একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত। এই অভিজাত ও ইলমি পরিবেশেই রুমির প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়েছিল। তিনি তাঁর মহান পিতার কাছ থেকে পবিত্র কুরআন, হাদিস ও ইসলামের অন্যান্য শাখায় প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। মাত্র আঠার বছর বয়সে বিয়ে করেন এবং উনিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম সন্তানের জন্ম হয়। তাঁর সন্তানদের মধ্যে দুজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম সন্তান সুলতান ওয়ালাদ এবং অপর সন্তান আলাউদ্দিন। সুলতান ওয়ালাদ পিতার অনুগত ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। রুমি তাঁর পিতার জীবদ্দশায় তাঁর বিশিষ্ট মুরিদ সাইয়্যেদ বুরহানুদ্দিন মুহাক্কিক তিরমিজীর তত্ত্বাবধানে চার-পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত অতিবাহিত করেন। রুমির বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তাঁর পিতা সপরিবারে কুনিয়ার উদ্দেশে বাল্‌খ ত্যাগ করেন। তাঁর এই জন্মভূমি পরিত্যাগ করার কারণ নিয়ে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। এর মধ্যে সুলতানের বিরাগভাজন হওয়া ও তাতারিদের আক্রমণের আশঙ্কা অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। বাহাউদ্দিন পথে ওয়াখ্‌শ এবং সমরকন্দে কিছুদিন কাটিয়ে নিশাপুর আসেন। এখানে বিখ্যাত কবি ও আধ্যাত্মিক পুরুষ শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তারের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। পিতার সাথে ছয় বছরের বালক রুমিও ছিলেন। আত্তার রুমির জন্য বিশেষ দোয়া করেন এবং তাঁকে তাঁর রচিত আসরার নামে গ্রন্থের একটি কপি উপহার দিয়ে ভবিষ্যতে তিনি একজন কামিল ব্যক্তি বা আধ্যাত্মিক পুরুষ হবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

অন্য এক বর্ণনা মতে রুমির পিতা বাহাউদ্দিন ১২১৭ খ্রিস্টাব্দে মালাতিয়া পৌঁছান। ১২১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিভাস-এ আসেন এবং ইবজিন জান-এর কাছাকাছি আকশিহির নামক স্থানে চার বছর অবস্থান করেন। ১২২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি লারিন্দা গমন করেন এবং সেখানে সাত বছর অবস্থান করেন। এখানে শারফুদ্দিন লালার কন্যা জাওহার খাতুনের সাথে রুমির বিয়ে হয়। সালজুক সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদের আমন্ত্রণে রুমির পিতা ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের কুনিয়ায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এখানেই ১২৩১ খ্রিস্টাব্দে বাহাউদ্দিনের ইন্তেকাল ঘটে।

পিতার মৃত্যুর পর রুমি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং ভক্তদের শিক্ষাদান, ওয়াজ-নসিহত ও ইলমে মারেফাত চর্চায় সময় কাটাতে থাকেন। রুমির পিতার মৃত্যুর এক বছর পর তাঁর মুরিদ বুরহানুদ্দিন মুহাক্কিক স্বীয় পীরের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে কুনিয়া আসেন। এসময় রুমি তাঁর কাছে মুরিদ হন এবং নয় বছরকাল তাঁর সাহচর্যে কাটান।

রুমি তাসাউফ শাস্ত্রে অধিকতর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে পরবর্তীকালে আলেপ্পো গমন করেন। এখানে ১২৩১-৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনি হালাবিয়া মাদ্রাসায় কামালুদ্দিন ইবনুল আদিমের কাছ থেকে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করেন। এরপর তিনি দামেস্কের মাদ্রাসা মুকাদ্দাসিয়ায় অবস্থান করেন এবং সর্ব-শায়খ মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি, সাদুদ্দিন হামাবি, উসমান রুমি, আওহাদুদ্দিন কিরমানি ও সাদরুদ্দিন কুনুবির সাহচর্য লাভ করেন এবং তাঁদের কাছ থেকে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করে ১২৩৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে কুনিয়ায় ফিরে আসেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এখানেই বসবাস করেন এবং ১২৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর এখানেই ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর পর তাঁকে কুনিয়াতেই সমাহিত করা হয়।

তদানীন্তন কালে বর্তমান তুরস্ককে বলা হতো রোম বা পূর্ব রোম। কুনিয়া ছিল পূর্ব রোমের রাজধানী। এই রোমের নামানুসারে মওলানা জালালুদ্দিন 'রুমি' নামেই সমধিক পরিচিত।

১২৩০ খ্রিস্টাব্দে ইবনুল আরাবির মৃত্যুর পর শায়খ সদরুদ্দিনসহ বেশ ক'জন আলেম কুনিয়ায় চলে আসেন এবং এসময় থেকে কুনিয়া জ্ঞানচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। রুমি শিক্ষাদান, ওয়াজ-নসিহত ও ফতোয়া প্রদানে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। এ সময় তাঁর প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল চার শতাধিক। ১২৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রুমির জীবনধারা এভাবেই চলছিল। এবছরই অকস্মাৎ শামসুদ্দিন তাবরিজি নামক একজন রহস্যময় ভ্রাম্যমাণ দরবেশ রুমির সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর সাক্ষাতের পর রুমির চিন্তা, কর্ম ও জীবনধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। তিনি তাঁর গতানুগতিক কর্মপদ্ধতি পরিহার করে সামা তথা সুফি নৃত্য ও আধ্যাত্মিক সঙ্গীতে মেতে ওঠেন। ছাত্র-মুরিদ-ভক্তদের পাঠদান, ওয়াজ-নসিহত সবকিছু পরিত্যাগ করে তিনি তাবরিজির সাথে একান্তে সময় কাটাতে থাকেন। এতে সংশ্লিষ্ট সবাই হতাশ ও বিরক্ত হয়ে পড়ে। তাদের সব ক্ষোভ গিয়ে পড়ে তাবরিজির ওপর। তারা তাঁকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করে তোলে। এক পর্যায়ে শামস তাবরিজি সবার অগোচরে কুনিয়া পরিত্যাগ করে চলে যান।

(এরপর পৃষ্ঠা ২)

■ **প্রধান সম্পাদক :** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ ■ **নির্বাহী সম্পাদক :** নিশাত বদরুল ■ **অঙ্গসজ্জা :** মেটাকেভ পাবলিকেশন্স ■ সৈয়দ রশীদ আহমদ মিশন ফাউন্ডেশনের পক্ষে সৈয়দ জুনায়েদ কে দোজা কর্তৃক ৯৪, নিউ ইস্কাটন, বাংলামটর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং জিনিয়াস প্রিন্টার্স ৪৬/১ পূর্ব তেজতুরী বাজার, ফার্মগেট, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। প্রাপ্তিস্থান: বাইতুর রহিম জামে মসজিদ ও আয়েশা হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়, ১২২১/১ পূর্ব মনিপুর, মিরপুর ঢাকা।